



Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)

A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture

Volume - v, Issue - iv, Published on October issue 2025, Page No. 14 - 19

Website: <https://tirj.org.in/tirj>, Mail ID: editor@tirj.org.in

(SJIF) Impact Factor 7.998, e ISSN : 2583 - 0848

ধর্মমঙ্গলের ‘ময়নাগড়’ প্রসঙ্গ : একটি পর্যালোচনা

ড. ধনঞ্জয় দাস

সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ

দুর্গাপুর সরকারি কলেজ

Email ID: ghananjyodas56@gmail.com



0009-0004-3686-1598

Received Date 28. 09. 2025

Selection Date 15. 10. 2025

Keyword

Dharmamangal,
 Ghanaram,
 Ruparam,
 History,
 Geography,
 Lausen,
 Maynagarh,
 Utkal, Purba
 Medinipur.

Abstract

Dharmamangal is one of the four main branches of Mangalkavya, a literary genre that emerged in Bengali literature after the Turkish invasion. This genre flourished in the 17th century, with poets like Ruparam, Ghanaram, Ramdas Adak, Sitaram Adak, Khelaram, and Manik Ganguli contributing to its development. Set against the backdrop of the Rarh region, Dharmamangal provides a detailed account of the region's history, geography, society, and culture, which is unparalleled in medieval Bengali literature. The narrative revolves around the glory of the God Dharma and the bravery of the Dom community. The epic poem meticulously follows historical legends and geographical details. Lausen, a feudal king, is the central character, with his capital at Maynagarh. The story of Maynagarh is a significant part of the Dharmamangal narrative. Despite debates about the location of Maynagarh, it is believed to be in Purba Medinipur district. The history and folklore surrounding Lausen are still prevalent in the region. Members of the royal family with the title Bahubalindra continue to reside in this regions presently. Historically, Mayna was the part of the Utkal kingdom during the medieval period. This article aims to explore the connection between the Lausen narrative and historical facts, the depiction of Maynagarh in the Dharmamangal epic, it's its ancient history and its current location. By Examining these questions, we seek to arrive at a definitive conclusion regarding the current location and historical significance of Maynagarh in the context of Dharmamangal narrative.

Discussion

১

তুর্কি আক্রমণ-উত্তর বাংলা সাহিত্যে যে দুটি সাহিত্য ধারা গড়ে উঠেছিল, মঙ্গলকাব্য তার মধ্যে অন্যতম। হিন্দুধর্মের সংকট কালে মূলত যুগগত তাগিয়ে উচ্চবৃত্তের সঙ্গে নিম্নবৃত্তের সংযোগের সেতু হিসেবে রচিত হয় দেবমাহাত্ম্যমূলক এই আখ্যানকাব্যগুলি। আর এই আখ্যানকাব্যের কেন্দ্রে থাকেন মনসা, চণ্ডী, ধর্ম, অন্নদার মতো দেবতারা। মনসামঙ্গল ও

চণ্ডীমঙ্গল কাব্যধারার তুলনায় ধর্মমঙ্গলের ধারা কিছুটা হলেও অর্বাচীন। সপ্তদশ শতাব্দীতে এই কাব্যধারার প্রচার ও বিস্তার। রূপরাম থেকে শুরু করে ঘনরাম, রামদাস আদক, সীতারাম আদক, খেলারাম, মানিক গাঙ্গুলি প্রমুখ কবিরা এই কাব্যধারাকে সমৃদ্ধ করেছেন। ধর্মদেবতার মাহাত্ম্য প্রতিষ্ঠা ও ডোম সম্প্রদায়ের মানুষের বীরত্বের গাথা বর্ণনাই এই কাব্যের মুখ্য বিষয়। রাঢ়ভূমির পটভূমিকায় রচিত এই কাব্যে রাঢ় অঞ্চল তার নিজস্ব সত্তা নিয়ে ধরা দিয়েছে। ধর্মমঙ্গলে রাঢ়ের ইতিহাস-ভূগোল-সমাজ-সংস্কৃতির এমন বিস্তৃত বিবরণ মধ্যযুগের আর কোনো সাহিত্যে নেই।

মঙ্গলকাব্যের যুগ আমরা অতিক্রম করে এসেছি। একবিংশ শতাব্দীতে এসে বিজ্ঞানের দৌলতে মানুষের জীবনধারার উন্নতি ঘটেছে, বদল ঘটেছে দেশের মানচিত্রের, পাল্টেছে বাঙালির জীবনচর্যা, মানসচর্যা ও সংস্কৃতি। মহাকাল হরণ করেছে অতীত ইতিহাসকে। তাই মঙ্গলকাব্যের স্থানিক ইতিহাস ও ভূগোলকে পুরোপুরি আবিষ্কার করা সহজ কাজ নয়। মনসামঙ্গলের চম্পকনগর, চণ্ডীমঙ্গলের গুজরাট নগরের ইতিহাস অন্বেষণে ইতিহাসের কিছু সূত্র, কিংবদন্তি, লোকশ্রুতি অথবা ভাঙাচোরা ঘটনা পরম্পরা আমাদের ভরসা যার ওপর ভর করে আমরা অতীতের ইতিহাসকে খুঁজে নিতে পারি। এই ইতিহাস যে সবক্ষেত্রে সামগ্রিক ইতিহাস নয় তা বলার অপেক্ষা রাখে না। এই প্রবন্ধে আমরা ইতিহাসের কিছু সূত্র, কিংবদন্তি, লোকশ্রুতি, ভাঙাচোরা ঘটনা পরম্পরা ও কাব্যের অভ্যন্তরীণ সূত্রের সাহায্যে ধর্মমঙ্গল কাব্যের প্রধান চরিত্র লাউসেনের রাজধানী ময়নাগড়ের ইতিহাসকে খুঁজে নেওয়ার চেষ্টা করব।

২

ধর্মমঙ্গল কাব্য ধর্মঠাকুরের মাহাত্ম্যকে কেন্দ্র করে রচিত আখ্যান। এই আখ্যানের সঙ্গে জড়িয়ে আছে দুটি কাহিনি। এক, রাজা হরিশ্চন্দ্রের আখ্যান, দুই, লাউসেনের আখ্যান। প্রথম আখ্যানটি খুব প্রাচীন। তুলনায় লাউসেনের কাহিনিকে কিছুটা অর্বাচীন বলে মনে করা হয়। রামাই পণ্ডিতের ‘শূন্যপুরাণে’ হরিশ্চন্দ্র রাজার কাহিনি বর্ণিত হয়েছে। লাউসেনের আখ্যান সেখানে নেই। ধর্মমঙ্গলে লাউসেনের আখ্যান যুক্ত হয়েছে সম্ভবত ময়ূর ভট্টের হাত ধরে। ধর্মঠাকুরের আশীর্বাদে শালে ভর দিয়ে কর্নসেন পত্নী রঞ্জাবতীর পুত্রলাভ, ধর্মের সাধক লাউসেনের নানা প্রতিকূলতার মধ্যে দিয়ে আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ ও শৌর্য-বীর্য-বীরত্বের কাহিনি ধর্মমঙ্গলের প্রতিপাদ্য বিষয়। এই আখ্যানে ধর্মঠাকুরের মাহাত্ম্য প্রচারের পাশাপাশি লাউসেনের বীরত্বের পরিচয়কে কবিরা বড় করে দেখাতে চেয়েছেন, প্রতিষ্ঠা দিতে চেয়েছেন এক জাতির বীরত্বের গাথাকে। এই আখ্যানের নায়ক লাউসেন ধর্মঠাকুরের অনুগ্রহপুষ্ট। ধর্মঠাকুরের কৃপায় ও নিজ বাহুবলে যে সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা লাউসেন করেন, সেই রাজ্যের রাজধানী ময়নাগড়। বৃদ্ধ কর্নসেনের সঙ্গে নিজের শ্যালিকা রঞ্জাবতীর বিবাহ দেওয়ার পর গৌড়েশ্বর তাঁদের ময়নাগড়ে পাঠান। অর্থাৎ ধর্মমঙ্গলের এই আখ্যানের সূচনা থেকে লাউসেনের সাম্রাজ্যের বিস্তার পর্যন্ত কাহিনির সঙ্গে ময়নাগড় প্রসঙ্গ যুক্ত। যাত্রাপথের বর্ণনার ক্ষেত্রের ময়নাগড়ের নামোল্লেখ করেছেন কবিরা।

ধর্মমঙ্গলের কাহিনিতে ধর্মপালের উল্লেখ প্রমাণ করে এই কাহিনির সঙ্গে ইতিহাসের কোনো না কোনো যোগাযোগ আছে। ধর্মমঙ্গলের কাহিনি যে নিছক গালগল্প নয়, পুরোপুরি ঐতিহাসিক না হলেও তাতে যে ইতিহাসের ছায়াপাত ঘটেছে তা সুখময় মুখোপাধ্যায় থেকে শুরু করে অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, আশুতোষ ভট্টাচার্যের মত সমালোচকেরা স্বীকার করে নিয়েছেন। সুখময় মুখোপাধ্যায় ধর্মমঙ্গলের মধ্যে ইতিহাসের উপাদান খুঁজে পেয়েছেন। এ বিষয়ে অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিমত -

“কেহ কেহ ধর্মমঙ্গলে বর্ণিত কাহিনিতে ইতিহাসের ইঙ্গিত আবিষ্কার করিয়াছেন, কেহ কেহ ভৌগোলিক বর্ণনার যথার্থ্য আবিষ্কার করিয়া পুলকিত হইয়াছেন, ইহাকে ‘রাঢ়ের জাতীয় মহাকাব্য’ (The National Epic of Rarha) বলিয়াছেন। চণ্ডী, মনসা ও কালিকামঙ্গলের কাহিনীগুলি সম্পূর্ণ রূপে কাল্পনিক তাহাতে সন্দেহ নাই, এবং কাল্পনিক বলিয়াই একজন কবির সঙ্গে অপর কবির বর্ণনার বিশেষ পার্থক্য দেখা যায়। স্থানীয় বর্ণনা ও ভৌগোলিক তথ্যের অনেক গোলমাল বিশৃঙ্খলা রহিয়াছে, কিন্তু ধর্মমঙ্গলের কাহিনী কেবল অঞ্চলবিশেষে সীমাবদ্ধ, এবং এ কাহিনীর মূলে কোন-না-কোন দিক দিয়া ঐতিহাসিক পটভূমিকার কিঞ্চিৎ সম্পর্ক আছে বলিয়া কাব্যকাহিনীটি নিতান্ত কল্পলোকে উধাও হয় নাই। বর্ণনা, স্থানের নাম-

ধাম-পরিচয়, আচার-ব্যবহার, জীবনচিত্র, সমাজ-পরিবেশ প্রভৃতি সমস্তই রাঢ় অঞ্চলের ব্যাপার – এখনও ইহার কিছু বজায় আছে।”^১

ইছাই ঘোষ বা ঈশ্বরী ঘোষ ঐতিহাসিক চরিত্র। লাউসেন ঐতিহাসিক চরিত্র নাকি কবিদের কল্পিত চরিত্র? বাস্তবেই লাউসেন নামে কি কোনো সামন্তরাজা ছিলেন? বিনয় ঘোষ লাউসেনের বাস্তব অস্তিত্ব সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করে বলেছেন -

“প্রশ্নও উঠতে পারে ‘সবার উপরে লাউসেন সত্য’ কিনা! অর্থাৎ লাউসেন আদৌ কোনো ঐতিহাসিক ব্যক্তি ও চরিত্র কিনা!”^২

তবে ঐতিহাসিক অন্ধাকাচরণ গুপ্ত লাউসেনকে ইছাই ঘোষের সমসাময়িক বলেছেন -

“ময়নাগড়ের রাজা লাউসেনকেও আমরা খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে আবির্ভূত বলিয়া মনে করি, কেননা তিনি ধর্মপূজা প্রবর্তক রামাই পণ্ডিতের সমসাময়িক, ...লাউসেনের সমসাময়িক বীরভূমের গোপরাজ ইছাই ঘোষ।”^৩

আশুতোষ ভট্টাচার্য লাউসেনকে অনৈতিহাসিক চরিত্র বলতে চাননি। তাঁর মতে,

“লাউসেনের কাহিনী একেবারেই অনৈতিহাসিক বলিয়াও উড়াইয়া দিতে পারা যায় না। কারণ, ইহাতে ঐতিহাসিক চরিত্র অন্তত ধর্মপালের উল্লেখ আছে। ইহার নায়ক গৌড়ের এক সামন্ত রাজপুত্র লাউসেন। সেই জন্য মনে হয়, ইহার মূলে সামান্য হইলেও ঐতিহাসিক ভিত্তি বর্তমান আছে।”^৪

লাউসেনকে অনৈতিহাসিক চরিত্র মনে না করার পিছনে তাঁর যুক্তি, বাংলা পঞ্জিকায় লাউসেনের নামের উল্লেখ, তিব্বতীয় ঐতিহাসিকের লবসেন নামে গৌড় রাজার উল্লেখ এবং রাঢ়বঙ্গে লাউসেনের প্রভাব। তিনি বলেছেন -

“এই সকল কারণে মনে হয়, লাউসেন নিতান্তই অনৈতিহাসিক ব্যক্তি ছিলেন না।”^৫

সম্ভবত দশম শতাব্দীতে তিনি আবির্ভূত হয়েছিলেন।

৩

ময়নাগড় কোথায়? ময়না ও ময়নাগড় কি একই স্থান? বাঁকুড়ার ময়না নামক স্থান বা পূর্ব মেদিনীপুরের ময়নাগড়ের সঙ্গে ধর্মমঙ্গলের ময়নাগড়ের কি কোনো সম্পর্ক আছে? ধর্মমঙ্গল কাব্য পাঠকালে জিজ্ঞাসু পাঠকের মনে এইসব প্রশ্ন বার বার উঁকি দিয়ে যায়। একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে মঙ্গলকাব্যে বর্ণিত ভূগোল্যের সবটুকু বাস্তব না হলেও বাস্তবের সঙ্গে তার যথেষ্ট যোগ আছে। মঙ্গলকাব্যের কবিরা ভূগোলবিদ নন। ভূগোলকে যথাযথ রূপ দেওয়ার দায়ও তাঁদের নেই। স্বভাবতই মঙ্গলকাব্যের কবিদের কাব্যে বাস্তবের সঙ্গে কল্পনার সংমিশ্রণ ঘটেছে। ধর্মমঙ্গল কাব্য রাঢ়ের জাতীয় মহাকাব্য। রাঢ় অঞ্চলে ছড়িয়ে থাকা বিভিন্ন স্থান যেমন ঢেকুর, শ্যামারূপা মায়ের মন্দির, লাউসেন তলা ইত্যাদি প্রমাণ করে ধর্মমঙ্গলের কাহিনী নিছকই গল্পকথা নয়। এই স্থানগুলির বর্তমান অস্তিত্ব প্রমাণ করে ধর্মমঙ্গলের কবিদের ভূগোল জ্ঞানের পরিচয়।

ধর্মমঙ্গল কাব্যে লাউসেনের রাজধানী ময়নাগড়। ময়নাগড়ের অবস্থান কোথায়? বাংলা সাহিত্যের সমালোচকদের কাছে এ এক বিতর্কের বিষয়। এ প্রশ্নের উত্তরে সমালোচকেরা দুভাগে বিভক্ত। একদল পশ্চিমবঙ্গের বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুর থেকে প্রায় বারো মাইল পূর্বে অবস্থিত ময়নাপুরকে ধর্মমঙ্গলের ময়নাগড় বলে মনে করেন। অন্য দল মনে করেন ময়নাগড়ের অবস্থান পূর্ব মেদিনীপুর জেলায়। বর্তমানে স্থানটি তমলুক মহকুমার ময়না থানার গড় সাফাং মৌজার অন্তর্গত। বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুরের নিকটবর্তী ময়নাকে যারা ধর্মমঙ্গলের ময়নাগড় বলে চিহ্নিত করতে চান, তারা এর সাপেক্ষে যেসব যুক্তি খাড়া করেন-

এক, ধর্মপূজা প্রবর্তক রামাই পণ্ডিত এই গ্রামেই বসবাস করতেন।

দুই, ময়নাপুর গ্রামে এখনও হাকন্দ পুকুর ও হাকন্দ মন্দিরের উপস্থিতি লক্ষ করা যায়।

তিন, রামাই পণ্ডিত ও তাঁর পূজিত ধর্মঠাকুর যাত্রাসিদ্ধি রায় বিষয়ক নানা লোককথা এই অঞ্চলে প্রচলিত রয়েছে।

আজও ময়নাপুর গ্রামে রামাই পণ্ডিতের বংশধররা বসবাস করেন।^৬

প্রথম মত নয়, ময়নাগড়ের অবস্থান বিষয়ে আমরা বরং দ্বিতীয় মতেরই অনুসারী। দ্বিতীয় মতটিকে গ্রহণযোগ্য মনে হওয়ার যথেষ্ট কারণও আছে। নিবিড়ভাবে ধর্মমঙ্গল কাব্য পাঠ করলে কাব্যের মধ্যে বেশ কিছু অভ্যন্তরীণ সূত্রও আবিষ্কার করা সম্ভব যা পূর্ব মেদিনীপুরের ময়নাগড়কে ধর্মমঙ্গলের ময়নাগড় বলার সাপেক্ষে আমাদের যুক্তিকে দৃঢ় করতে সাহায্য করে। শুধু কাব্যের অভ্যন্তরীণ সূত্র নয়, ক্ষেত্রসমীক্ষা থেকে প্রাপ্ত তথ্যগুলিও পূর্ব মেদিনীপুরের ময়নাগড়কে ধর্মমঙ্গলের ময়নাগড় বলার দাবিকে আরো জোড়ালো করে –

এক, আমরা যে বাঁকুড়া জেলার ময়নাকে ধর্মমঙ্গলে বর্ণিত ময়নাগড় বলছি না তার প্রধান কারণ ধর্মমঙ্গলের কবিদের অধিকাংশই ময়নাগড়কে সমুদ্র নিকটবর্তী বলেছেন। লাউসেন রমতি নগরে পৌঁছে কর্মকারের নিজের পরিচয়জ্ঞাপন করতে গিয়ে ময়নাকে ‘সাগর সমীপ’ বলেছেন। ঘনরাম চক্রবর্তী তাঁর ধর্মমঙ্গল কাব্যে বলেছেন–

‘ময়নানগর বাড়ি সাগর সমীপ।

পিতা মহাশয় মোর যার।’^{১৭}

মানিকরাম গাঙ্গুলি তাঁর ধর্মমঙ্গল কাব্যে লিখেছেন– “শুনেচি দক্ষিণে ঘর সমুদ্রের কূলে।”^{১৮} এর থেকে সহজেই অনুমেয় বাঁকুড়া জেলার ময়না ধর্মমঙ্গলের ময়নাগড় নয়। কারণ এই ময়না কখনোই সাগর সমীপে অবস্থিত নয়। পূর্ব মেদিনীপুরের ময়নাগড় সাগর তীরবর্তী স্থান। আবার এই ময়নাগড় রাঢ়ের দক্ষিণেও অবস্থিত।

দুই, রূপরাম চক্রবর্তীর ধর্মমঙ্গল কাব্যে দক্ষিণ ময়না গ্রামের উল্লেখ আছে। রূপরামের ধর্মমঙ্গলের বিবাহ পালায় রয়েছে–

‘দক্ষিণ ময়না মোর আছয়ে বসতি।

কর দিয়া সর্বকাল করহ রাজতি।’^{১৯}

পূর্ব মেদিনীপুর জেলায় দক্ষিণ ময়না নামে একটি গ্রামের অস্তিত্ব আজও রয়েছে। ধর্মমঙ্গলের কাহিনি থেকে জানা যায় লাউসেন গৌড়েশ্বরের কাছে থেকে উপহারস্বরূপ এই দক্ষিণ ময়না পেয়েছিলেন। শুধু তাই নয়, এই গ্রামের একটি স্থান আজও ‘ডোমনীকেল্লা’ নামে পরিচিত যা ধর্মমঙ্গলের স্মৃতিকে বহন করে নিয়ে চলেছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, লখাই ডোমনী ধর্মমঙ্গলের একটি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র।

তিন, ধর্মমঙ্গল কাব্যে পদুমার বিলের বা পদ্মা বিলের উল্লেখ রয়েছে–

রাঙ্গামেটা মন্দারন যায় এড়াইয়া।’

পদুমার বিলে সেন উত্তরিল গিয়া।’^{২০}

ময়নাগড় থেকে মাত্র ২৫ কিলোমিটার দূরে পিংশলায় সেই বিল আজও বর্তমান।

চার, ধর্মমঙ্গল কাব্যের মধ্যে একাধিক যাত্রাপথের বর্ণনা আছে। এই যাত্রাপথ কখনো গৌড় থেকে ময়নাগড় পর্যন্ত, কখনো ময়নাগড় থেকে গৌড় পর্যন্ত, আবার কখনো তা গৌড়ের সীমানা ছাড়িয়ে বিস্তৃত হয়েছে কামরূপ পর্যন্ত। ময়নাগড় থেকে গৌড় বা গৌড় থেকে ময়নাগড়ের যাত্রাপথের বর্ণনা খেয়াল করলে দেখা যাবে তাতে বারবার কাশীজোড়া, প্রতাপপুর, কুতুবপুর ইত্যাদি স্থানের কথা বলা হয়েছে। লাউসেন গৌড় থেকে ময়নায় আসছেন। এই যাত্রাপথের বর্ণনায় কবি ঘনরাম চক্রবর্তী বলেছেন–

‘মন্দারণ গড়খানা রাখি ডানি ভাগে।

প্রদোষে প্রতাপপুর প্রবেশিলা আগে।।

সেদিন সেখানে রণ থাকে বান্ধা ঘোড়া।

পরদিন প্রভাতে পেরোন কাশীজোড়া।।

কুতুবপুর রাখে দূর পরম সন্তোষ।’^{২১}

গড় মন্দারণ, প্রতাপপুর, কাশীজোড়া, কুতুবপুর - এই স্থানগুলি পূর্ব মেদিনীপুরের ময়নাগড় থেকে বেশি দূরবর্তী নয়।

পাঁচ, ময়নাগড়ের সঙ্গে ধর্মমঙ্গল, ধর্মঠাকুর ও ধর্মপূজার যোগ গভীর। স্থানটি ধর্মঠাকুরের আদি পীঠস্থান হিসেবেও পরিচিত। ময়নাগড়ের রাজ পরিবারের একটি অংশ ধর্মের গড় নামে পরিচিত। একথা ঠিক লাউসেন প্রতিষ্ঠিত ধর্মঠাকুর আজ আর ময়নাগড়ে নেই। কেন লাউসেন প্রতিষ্ঠিত ধর্মঠাকুর ময়নাগড়ে নেই এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়ে দুটি জনশ্রুতির কথা

জানা যায়। উনিশ শতকের শুরুর দিকে ধর্মঠাকুরের মন্দিরটি ভেঙে পড়লে ময়না থানার অন্তর্গত কালাগন্ডা গ্রামে নাকি ধর্মঠাকুরের মূর্তিটিকে স্থানান্তরিত করা হয়। ভাদ্র মাসের সংক্রান্তিতে নৌকাযোগে ধর্মঠাকুরকে ময়নাগড়ে নিয়ে আসা হয়। অন্য জনশ্রুতি অনুযায়ী, লাউসেন পরবর্তী সময়ে তাঁর প্রতিষ্ঠিত ধর্মঠাকুর রাজপরিবারের অবজ্ঞাজনিত কারণে ময়নাগড় ত্যাগ করে বৃন্দাবনচকের পণ্ডিত উপাধিধারী পরিবারে চলে যান। ময়নাগড়ে রক্ষিণী দেবীর পূজা হয়, রয়েছে দেবীর মূর্তিও। এই রক্ষিণী দেবীর কথা ধর্মমঙ্গলে রয়েছে। ধর্মঠাকুরের আশীর্বাদপুষ্ট লাউসেন রক্ষিণী দেবীরও উপাসক ছিলেন। লখাই পত্নীর যুদ্ধযাত্রার প্রাক্কালে রক্ষিণী দেবীর পূজা করেছেন। ময়নাগড়ে রক্ষিণী দেবীর স্বতন্ত্র কোনো মন্দির নেই। ক্ষেত্রসমীক্ষা থেকে জানা যায়, একসময় ময়নাগড়ের মধ্যেই রক্ষিণী দেবীর মন্দির ছিল। এই মন্দির ধ্বংসপ্রাপ্ত হওয়ায় লোকেশ্বর মন্দিরে রক্ষিণী দেবীর মূর্তি স্থানান্তরিত করা হয়। এখানেই দেবী রক্ষিণী আজও বিরাজমান। Bengal District Gazetteers, Midnapore-এ ময়নাগড়কে মেদিনীপুর জেলার অংশ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। লাউসেনের উল্লেখ করে সেখানে বলা হয়েছে -

“According to the family records, the fort was originally constructed by one of the semi-mythical heroes of Midnapore, Raja Lau sen, in the days when the district was under the dominion of the Kings of Gour.”^{২২}

8

ময়না সম্পর্কে বলতে গিয়ে বিনয় ঘোষ বলেছেন -

“ময়নার দক্ষিণে কেলেঘাই (কালীঘাই) নদী, উত্তরে কাঁসাই বাক্সি ও পাঁচতুয়ী নদী, পশ্চিমে সবং এবং পূবে তমলুক পরগণা। কাঁসাই কেলেঘাই বাক্সি ক্ষীরাই চণ্ডী প্রভৃতি একদা একসঙ্গে মিলিত হয়ে সমুদ্রে পড়ত এবং অতীতে সমুদ্র খুব দূরে ছিল না, তমলুক বন্দর-নগর থেকে। কলেক্টরির নথিপত্রে ময়না অঞ্চল ‘ময়নাচর’ নামে বর্ণিত, উৎকল শাসনকালে ময়না ‘চউরা’ (দ্বীপাকার ভূমি) এবং হিন্দুযুগে ময়না ‘মণ্ডল’ নামে পরিচিত। উৎকলরাজের শাসনকালে তাঁদের রাজ্য কতকগুলি ‘দণ্ডপাটে’ এবং দণ্ডপাট কতকগুলি ‘বিষয়’ নিয়ে গঠিত ছিল প্রশাসনিক সুবিধার জন্য।”^{২৩}

মধ্যযুগে ময়না উৎকল রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। উৎকল রাজারা বাংলার মেদিনীপুর পর্যন্ত তাঁদের রাজত্বের বিস্তার ঘটিয়েছিলেন। এই সময় গোটা উৎকলের দণ্ডপাটের সংখ্যা ছিল ৩১। এই ৩১টি দণ্ডপাটের মধ্যে ৬টি ছিল মেদিনীপুরের সীমানাধীন। জলৌতি দণ্ডপাট এই ৬টি দণ্ডপাটের মধ্যে একটি। ময়না, পিংলা ও সবং জলৌতি দণ্ডপাটের অন্তর্গত ছিল। ইতিহাস থেকে জানা যায় পঞ্চদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে কপিলেন্দ্র দেব উৎকলের সিংহাসনে বসেন। কপিলেন্দ্রদেবের এক অধস্তন সেনানায়ক কালিন্দীরাম সামন্ত তাঁরই অনুমতিতে ১৪৩৪ খ্রিস্টাব্দে বালিসীতাগড়ে রাজত্ব শুরু করেন। এই কালিন্দীরাম সামন্তই সম্ভবত বাহুবলীন্দ্র রাজবংশের আদি পুরুষ। এই বংশের ষষ্ঠ পুরুষ গোবর্ধন সামন্ত ষোড়শ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে বালিসীতাগড় থেকে তাঁর রাজধানী ময়নাগড়ে স্থানান্তরিত করেন। উৎকলরাজ মুকুন্দদেবের কাছে থেকে কালিন্দীরাম ‘বাহুবলীন্দ্র’ উপাধি পান। গোবর্ধন সামন্তের সময় থেকেই ময়নাগড় বাহুবলীন্দ্র রাজ পরিবারের সদস্যরা ময়নাগড়ে বসবাস শুরু করেন।

এ তো গেল ময়নাগড়ের অতীত ইতিহাস। বর্তমান ময়নাগড়ের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করা যেতে পারে। ময়নাগড় পূর্ব মেদিনীপুর জেলার তমলুক মহকুমার ময়না থানার গড় সাফাং মৌজার অন্তর্গত। তমলুক থেকে মাত্র ২১ কিলোমিটার দূরে এর অবস্থান। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে পরিপূর্ণ দ্বীপভূমি ময়নাগড়ের আয়তন প্রায় পঁয়ত্রিশ একর। একসময় ময়নাগড় তিনটি পরিখা দ্বারা বেষ্টিত থাকলেও বর্তমানে এই দ্বীপভূমিকে ঘিরে রয়েছে দুটি পরিখা। গড় সংলগ্ন পরিখাটির অর্থাৎ ভেতরের গড়টি ‘কালিদহ’ নামে পরিচিত। বাইরের গড়টির নাম ‘মাকড়দহ’ নামে পরিচিত। ময়নাগড়ের মধ্যেই রয়েছে ধর্মের গড়, মহাকালী রক্ষিণী, লোকেশ্বর শিবমন্দির, শ্যামসুন্দরজিউ মন্দির। ময়নাগড়ের মানুষেরা বিশ্বাস করেন, ময়নাগড়ের

সুবিষ্ঠিত পরিখা থেকে শুরু করে লোকেশ্বর শিবমন্দির, রক্ষিণী দেবীর মন্দির সবই লাউসেন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। ময়নাগড়ে লাউসেন ও তাঁর মা রঞ্জাবতী আজও পূজিত হন। বাহুবলীন্দ্র রাজবংশের সদস্যরা আজও সেখানে বসবাস করেন।

সময়ের বদলের সঙ্গে সঙ্গে ময়নাগড়ের চেহারা বদলেছে। কিন্তু ময়নাগড়ের অতীতের গৌরবময় অধ্যায়ের উজ্জ্বলতা কমেনি। ধর্মমঙ্গল ও লাউসেনের আলোচনায় ময়নাগড় আজও সমান প্রাসঙ্গিক। তাইতো মধ্যযুগের গবেষক ও অনুরাগী পাঠকেরা আজও ময়নাগড়ে ছুটে যান।

Reference:

১. বন্দ্যোপাধ্যায়, অসিতকুমার, বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, তৃতীয় খণ্ড : প্রথম পর্ব, মডার্ন বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা-৭৩, ২০০৬-০৭, পৃ. ৩০৪
২. ঘোষ, বিনয়, পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি, দ্বিতীয় খণ্ড, প্রকাশ ভবন, কলকাতা-৭০০০৭৩, আগস্ট ২০১৮, পৃ. ১৮৫
৩. গুপ্ত, অম্বিকাচরণ, হুগলী বা দক্ষিণ রাঢ়, ললিতোহন পাল দ্বারা প্রকাশিত, কলিকাতা, ১৩২১, পৃ. ১৬৯
৪. ভট্টাচার্য, আশুতোষ, বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, এ. মুখার্জী অ্যান্ড কোং প্রাঃ লিঃ, মে ২০১৫, পৃ. ৫৭৩
৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৭৪
৬. বন্দ্যোপাধ্যায়, চারু সম্পাদিত, শূন্যপুরাণ, পৃ. ৭৩
৭. মহাপাত্র, পীযুষ কান্তি সম্পাদিত, ঘনরাম চক্রবর্তী বিরচিত শ্রীধর্মমঙ্গল, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০১২, পৃ. ২৭৫
৮. দত্ত, বিজিতকুমার ও দত্ত, সুনন্দা সম্পাদিত, মানিকরাম গাঙ্গুলি-বিরচিত ধর্মমঙ্গল, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলিকাতা-৭৩, ২০০৯, পৃ. ২৮৮
৯. কয়াল, অক্ষয়কুমার সম্পাদিত, ধর্মমঙ্গল রূপরাম চক্রবর্তী বিরচিত, ভারবি, কলকাতা-৭৩, চতুর্থ মুদ্রণ শ্রাবণ ১৪২২, পৃ. ৭৫
১০. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭৬
১১. মহাপাত্র, পীযুষ কান্তি সম্পাদিত, ঘনরাম চক্রবর্তী বিরচিত শ্রীধর্মমঙ্গল, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০১২, পৃ. ৩৪৮
১২. O'MALLEY, L.S.S, Bengal District Gazetteers, Midnapore, The Bengal Secretariat book depot, Calcutta, 1911, p. 208
১৩. ঘোষ, বিনয়, পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি, দ্বিতীয় খণ্ড, প্রকাশ ভবন, কলকাতা-৭০০০৭৩, আগস্ট ২০১৮, পৃ. ১৮৩

Bibliography:

- রায়, নীহাররঞ্জন, বাঙালির ইতিহাস (আদি পর্ব), দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭০০০৭৩, ১৩৫৬
- সেন, দীনেশচন্দ্র, বৃহৎ বঙ্গ (সুপ্রাচীন কাল হইতে পলাশীর যুদ্ধ পর্য্যন্ত), কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৩৪১
- সেন, সুকুমার, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (আদি হইতে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ পর্য্যন্ত) সুকুমার সেন, মডার্ন বুক এজেন্সী, কলিকাতা, ১৯৪০
- বসু, যোগেশচন্দ্র, মেদিনীপুরের ইতিহাস (১ম ও ২য় ভাগ), কালিকা প্রেস, কলিকাতা, ১৩২৮
- ভৌমিক, অরিন্দম, মেদিনীকথা পূর্ব মেদিনীপুর পর্যটন ও পুরাকীর্তি, মেদিনীপুর, ১৪২৩
- দাশগুপ্ত, কৌশিক সম্পাদিত, মঙ্গলকাব্য অন্তলীন পাঠ, আশাদীপ, কলকাতা-৭০০০০৯, ফেব্রুয়ারি, ২০২১
- নস্কর, সনৎ ও মল্লিক, দীপঙ্কর সম্পাদিত, তব্য একলব্য মঙ্গলকাব্য বিশেষ সংখ্যা, দি গৌরী কালচারাল এন্ড এডুকেশনাল অ্যাসোসিয়েশন, জুন ২০২২